এসো
জীবন গড়ি
২
আবদুল মান্নান তালিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড কর্তৃক বাংলা মাধ্যম কিণ্ডার গার্টেন ও বেসরকারী স্কুল সমূহের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদিত।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠোপযোগী

এসো জীবন গড়ি-২

দ্বিতীয় ভাগ

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

প্রকাশনায়
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
৭৩, আউটার সার্কুলার রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৩০২০২, ফ্যাক্স : ৮৩১৮৬১১
Website : www.les.com
E-mail : les@lesbd.,com

৩১তম সংস্করণ :

মাঘ : ১৪১৬ বাংলা
মহররম : ১৪৩১ হিজরী
জানুয়ারী : ২০১০ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : মশিউল আলম

মূল্য : ৪০.০০ (চল্লিশ টাকা)

ASHO JIBON GARI
Published by Islamic Education Society

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কচি-কিশোরদের কচি থাকতেই গড়ে তুলতে হবে। এজন্য ইসলামের আদর্শই সবচাইতে উপযোগী। চরিত্র গঠনের এর চাইতে ভালো উপাদান আর কোন আদর্শেই পাওয়া যাবে না। ইসলাম মানুষকে যে ভাবে গড়ে তুলতে চায়, তাকে যে সমস্ত সদগুণের আধার দেখতে চায়, তাকে যেভাবে আল্লাহর বান্দা, মানুষের সেবক ও দুনিয়ার পরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেসব দিকে দৃষ্টি রেখেই কচি-কিশোরদের জন্য এ বই তৈরী করা হয়েছে।

অধুনা কিশোরদের নিছক হাসিখুশীর দু-চারটে উপাদান দিয়েই এগিয়ে দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পদ্ধতি কিশোরদের যথার্থ মানুষরূপে গড়ে তোলা তো দূরের কথা তাদের মধ্যে কোন আধুনিক সভ্য দেশের সচেতন ও উন্নত নাগরিকের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সৃষ্টিতেও ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক সমাজকে এ সংকটমুক্ত করার জন্য এ প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা কিছু কিশোরের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

আবদুল মান্নান তালিব
১৮০, শান্তিবাগ, ঢাকা।
ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। এটা 'এসো জীবন গড়ি' দ্বিতীয় ভাগের ২৯তম সংস্করণ। এ সংস্করণে রচনাগুলোকে একটু নতুন করে ঝালাই করা হলো। আরো নতুন কয়েকটা রচনা এর সাথে যোগ করা হলো। এর ফলে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বইয়ের গুরুত্ব ও উপযোগিতাও বেড়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ।

এ প্রসংগে জোরালোভাবে উত্থিত হয় চারিত্রিক পরিবেশের কথা। ইসলাম তার প্রাথমিক যুগগুলোতে যে চারিত্রিক পরিবেশটা গড়ে তুলেছিল তার একটা নিখুঁত চিত্র আমরা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি এই রচনাগুলোতে। মুসলিম শিশুমানস গঠনে এ অবস্থাটা সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে। এটা কোন অস্বাভাবিক পরিবেশ নয়। বরং আজকের বিশ্বসভ্যতা ও বিশ্ব-পরিবেশ বিকৃতির যে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তার ফলে আমাদের নজরে এ উন্নত মানবিক পরিবেশটা অস্বাভাবিক ঠেকছে। কিন্তু পরিবেশ যতই বিকৃত হোক উন্নত মানবিক গুনাবলীই তো আমাদের লক্ষ্য। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল। সহী হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছেঃ বুঈসতু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক-'আমাকে পাঠানো হয়েছে উন্নত মানবিক গুনাবলীকে পূর্ণতা দান করার জন্য।' কাজেই যুগে যুগে আমাদের শিশুদেরকে আমরা এভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা করবো। ইসলাম ও মুসলমানদের বিগত চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে এর দৃষ্টান্তের কোনো কমতি নেই। আমাদের শিশুরা ইসলামের পরিপূর্ণ চারিত্রিক গুণে গুনান্বিত হয়ে গড়ে উঠুক এটাই আমরা কামনা করি।

আবদুল মান্নান তালিব
১৮০, শান্তিবাগ, ঢাকা।

সূচীপত্র

আল্লাহর ভয়

আল্লাহ্ আমাদের প্রভু। আল্লাহ্ আমাদের মালিক। আল্লাহ্ আমাদের স্রষ্টা। আল্লাহ্ আমাদের খাবার দেন। তাই আমরা খাই। এই যেসব শাকসব্জি, ফলমূল, গৃহপালিত পশু, হাঁস মুরগি, আকাশে উড়ে চলা পাখি, যেগুলো আমরা খাই, এগুলো আল্লাহ্ আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ আমাদের জন্য পানি সৃষ্টি করেছেন। পানি আমরা পান করি। আমাদের জন্য বাতাস সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিই।

মোটকথা আল্লাহ্ আমাদের জীবন দিয়েছেন। দুনিয়ায় আমাদের প্রতিপালন করছেন। তাই আমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলি। আল্লাহরই ইবাদত বন্দেগী করি।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। আল্লাহু আকবার।

আমরা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করি। আর কাউকে ভয় করিনা। আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই। আর কারোর কাছে সাহায্য চাইনা। কারণ আমরা জানি সাহায্য করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর আছে। আর কারোর নেই।

সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আমরা জানি মৃত্যুর পর আমাদের আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে আমাদের সমস্ত কাজের হিসেবে দিতে হবে। দুনিয়ায় ভালো কাজ করলে আল্লাহ্ আমাদের পুরষ্কার দেবেন। খারাপ কাজ করলে দেবেন শাস্তি।

আমরা যদি কোনো অন্যায় করি, কাউকে ঠকাই, কারোর প্রতি জুলুম অত্যাচার করি, মিথ্যা বলি, কারোর জিনিস চুরি বা অন্যায়ভাবে দখল করি, কারোর সাথে অসৎ আচরণ করি এবং কোনো প্রকার খারাপ কাজ করি, তাহলে আমাদের পাকড়াও করবেন। কিয়ামতের ময়দানে চুল চেরা বিচার করে আমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন। আল্লাহর সেই শাস্তির হাত থেকে আমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

তাই আমরা আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে দুনিয়ার সবকাজ করি। এব্যাপারে আমাদের আগের জামানার মুসলমানরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

তখন চলছিল ইসলামী খিলাফতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসন আমল। তিনি বিশাল ইসলামী রাজ্যের খলীফা হলে কি হবে থাকতেন সাধারণ

লোকের মতো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিনি ছিলেন একজন নিকটতম সহচর। ইসলামের শিক্ষা দীক্ষা তিনি তাঁর কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। যেভাবে প্রিয় নবী (স) দেশ শাসন করতেন তিনিও সেভাবে বিশাল ইসলামী জাহান পরিচালনা করছিলেন। তাই তিনি অতবড় ইসলামী রাজ্যের শাসক হয়েও নিজেকে প্রজা সাধারণের খাদেম মনে করতেন। রাত্রে বেশ বদল করে নগরের পথে পথে অলিতে গলিতে ঘুরতেন। কখনও কারোর বাড়িতে গিয়েও হাজির হতেন। নিজের চোখে সবার অবস্থা দেখতেন। নিজের কানে মানুষের অভিযোগ শুনতেন। মানুষের অভাব দূর করতেন। প্রজাদের দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভোগ দূরবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করতেন। সরকারের সমস্ত সহায় সম্পদ দিয়ে যতদূর সম্ভব তাদের সাহায্য করতেন। এই সঙ্গে তাদের জীবন ধারণে এবং চরিত্রে কোনো দোষক্রটি দেখা দিলে তারও সংশোধন করতেন।

এমনিভাবে এক রাতে বেশ বদল করে নগরের পথে বের হলেন। অনেকগুলো বাড়ি গলি পার হয়ে বেশ অনেক দূরে চলে গেলেন। নিশুতি রাত। সবাই ঘুমিয়ে আছে। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। কিন্তু একটি গৃহের মধ্যে দেখলেন আলো জ্বলছে। কিছু কথাবার্তার আওয়াজও কানে এলো।

মা মেয়েকে বলছে, 'দেখো বেটি রাত আর বেশি নেই। রাত থাকতে থাকতে দুধে পানিটা মিশিয়ে ফেলো। দিনের বেলা মানুষের সামনে মেশানো যাবে না।'

'না মা, আমি পারবোনা' মেয়ে বললো।

'না পারলে চলবে কেমন করে বলো? এই সামান্য দুধ বিক্রি করে আমাদের এক বেলাও চলেনা। এক বেলা খেয়ে আর অনাহারে থেকে আর কতদিন চলা যায়? তাছাড়া পানি মেশালে কে-ইবা দেখতে পাবে?'

'কেউ না দেখলেই বা কি?' মেয়ে আবার বলল, 'খলীফা হুকুম দিয়েছেন, দুধে পানি মিশালে শাস্তি দেয়া হবে। খলীফার হুকুম অমান্য করে আমরা শাস্তির ভাগী হতে যাবো কেন? তার চেয়ে আমরা একবেলা একমুঠো খাবো তাও ভালো।'

'আমরা পানি মেশালে খলীফা তো আর দেখতে পাবেন না। কাজেই আমাদের শাস্তি দেবেন কেমন করে?' মা শেষবারের মতো জোর দিয়ে বললো।

'বাহ! খলীফা না দেখলে কি আল্লাহ দেখতে পাবেন না? আমি খলীফার চাইতে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করি বেশি।' মেয়ে নিজের অটল সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল।

হযরত উমর (রা) মেয়েটির মনে যথার্থ আল্লাহর ভয় দেখে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। গৃহটির অবস্থান ও নিশানী মনে রেখে ঘরে ফিরে এলেন।

পরদিন তিনি মেয়েটিকে ও তার মাকে ডেকে পাঠালেন। তাদের মুখ দিয়ে তাদের গত রাতের কথাবার্তার সত্যতা যাচাই করলেন। তারা মা মেয়ে সত্য কথাই বললো। মা ভেবেছিলেন খলীফা তাদের শাস্তি দেবেন। কিন্তু খলিফা মেয়েটিকে নিজের পুত্রবধু করতে চাইলেন। নিজের ছেলে আসেমের (রা) সাথে তার বিয়ে দিলেন।

পরবর্তীকালে খিলাফতে রাশেদার আদর্শের পতাকাবাহী মুসলিম দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন এই মেয়েটিরই পৌত্র।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

১. আমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলি কেন?

২. আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই কেন?

৩. মৃত্যুর পর আমাদের আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে কেন?

৪. দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) কার কাছ থেকে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছিলেন?

৫. মা মেয়েকে কি করতে বলছিল?

৬. মেয়ে কার ভয়ে পানি মেশাতে রাজি হয়নি?

৭. খলীফা মেয়েটিকে কি পুরষ্কার দিলেন?

বিস্তারিত উত্তর দাও ঃ

১. আল্লাহ আমাদের জন্য কি কি খাবার সৃষ্টি করেছেন?

২. আল্লাহ আমাদের পাকড়াও করবেন কেন?

৩. খলীফা রাতে বেশ বদল করে অলিতে গলিতে ঘুরতেন এবং মানুষের বাড়িতে যেতেন কেন?

৪. মা কেন মেয়েকে দুধে পানি মেশাতে বলছিলেন?

৫. পরদিন খলীফা কি করলেন?

আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা

দুনিয়ায় আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন কাজ করার জন্য। আমাদের কাজ করতে হয়। আমরা কাজ করি। কাজে আমরা কখনো সফল হই। আবার কখনো হই বিফল।

আমাদের কাজ করার ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাকে আমরা কাজে লাগাই। আমাদের জ্ঞান আছে। আমরা জ্ঞানকে কাজে লাগাই। কাজটি কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার কৌশল ঠিক করি। কাজ করার যোগ্যতা আছে বলেই আমরা কাজ করি। যে কাজ করার যোগ্যতা নেই আমরা সে কাজটা করতে পারি না।

আমরা যদি একটু ভালোভাবে ভেবে দেখি তাহলে বুঝতে পারবো, আমাদের এই সব ক্ষমতা, যোগ্যতা ও বুদ্ধি-জ্ঞান কোনটাই আমাদের নিজেদের অর্জিত নয়। এ সবই মহান আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। আমাদের কোন যোগ্যতার কারণে তিনি এসব আমাদের দেননি। দয়া পরবশ হয়ে দুনিয়ায় মানুষের মতো মানুষ হয়ে জীবন যাপন করার জন্য তিনি এসব দান করেছেন।

এ জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রশংসা করি সকাল সন্ধ্যায় দুপুরে বিকেলে রাতে। তাঁর গুণ গাই। যে ভাবে তিনি প্রশংসা করতে বলেছেন সেভাবে তাঁর প্রশংসা করি। আমরা নিজেরা একটা প্রশংসা পত্র তৈরী করে তা পাঠ করি না। বরং তিনি যা পাঠ করতে বলেছেন তাই পাঠ করি।

আমরা তাঁর দয়া ও করুনা চাই। তাঁর দয়া ও করুনা আমাদের প্রয়োজন। তাঁর দয়া ও করুনা বাদ দিয়ে অন্য কারোর দয়া ও করুনার আমাদের প্রয়োজন নেই। অন্যের দয়া ও করুনার পেছনে তার নিজের প্রয়োজন ও স্বার্থ আছে। কিন্তু আল্লাহর দয়া ও করুনার পেছনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন ও স্বার্থ নেই।

বরং আমাদের প্রয়োজন আছে বলেই তিনি আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র ও করুনাশীল।

কাজেই আমরা কাজ করি। আমাদের কাজের পেছনে থাকে আল্লাহর দয়া ও করুনা। তাই আমরা কাজ করি কিন্তু নির্ভর করি আল্লাহর দয়া ও করুনার ওপর। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি জ্ঞান ও যোগ্যতার ওপর নির্ভর করি না। আল্লাহ চাইলে আমরা সফল হই, না চাইলে সফল হই না। আমরা জানি আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট।

একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজদ এলাকায় যাতুর রিকা যুদ্ধ শেষ করে মদীনার দিকে ফিরে আসছিলেন। সাহাবাগণ তাঁর সংগে ছিলেন। দুপুরের

দিকে তাঁরা সবাই একটি ময়দানে পৌঁছে গেলেন। ময়দানে ছিল অনেকগুলো কাঁটা গাছের ঝোপঝাড়। এই ঝোপঝাড়গুলোর ছায়ায় তারা চাচ্ছিলেন একটু বিশ্রাম নিতে।

লোকেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। যার যার পছন্দ মতো গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন। প্রিয় নবী (স) একটি বাবলা গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। তাঁর তলোয়ার খানি ঝুলিয়ে রাখলেন গাছের একটি ডালে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমন সময় একজন মুশরিক সেখানে এসে হাজির।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘুমন্ত দেখে তার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপলো। ভাবলো এই মহা সুযোগ। এইবার তলোয়ারের এক কোপে মুহাম্মদকে (স) নিশ্চিহ্ন করে দেবো দুনিয়ার বুক থেকে। নিসাড়ে প্রিয় নবীর (স) মাথার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

তলোয়ারে হাত দিল। মৃদু আওয়াজ হলো।

প্রিয় নবীর (স) দুচোখের পাতা খুলে গেলো।

তিনি দেখলেন, একজন মুশরিক যুবক খোলা তলোয়ার হাতে তাঁর সামনে দন্ডায়মান।

'আপনি আমাকে ভয় করেন?'

'না।'

'তাহলে আমার হাত থেকে এখন কে আপনাকে রক্ষা করবে?'

'আল্লাহ' 'আল্লাহ!' 'আল্লাহ!'

প্রিয় নবীর (স) অবিচল কণ্ঠের আওয়াজে মুশরিকের দিল কেঁপে উঠলো। তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেলো।

প্রিয় নবী (স) তলোয়ারটি উঠিয়ে নিয়ে এবার তাকে বললেন,

'বলো, আমার হাত থেকে, কে তোমাকে রক্ষা করবে?

মুশরিক বললো, আপনি সবচেয়ে ভালো রক্ষাকারী।

প্রিয় নবী (স) তাকে ছেড়ে দিলেন।

প্রিয় নবীর (স) আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ছিল এমনই অবিচল।

আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ ক্ষমতা দেন তাই মানুষ, জীব ও জড় সবাই ক্ষমতা পায়।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

'যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রভু, তারপর তাদের একথার ওপর তারা অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতারা এসে বলতে থাকে ঃ তোমাদের কোন ভয় নেই, কোন দুর্ভাবনাও নেই। তোমরাই প্রবল হবে যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি সত্যই ঈমান এনে থাকো।'

প্রথমে আল্লাহর প্রতি ঈমান। তারপর তার প্রতি নির্ভরতা। দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় শক্তি আর নেই।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. আমাদের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও বুদ্ধিজ্ঞান কি আমাদের অর্জিত?
২. আমরা কখন আল্লাহর প্রশংসা করি?
৩. আমরা আল্লাহর দয়া ও করুনা চাই কেন?
৪. আমরা কাজ করি কিন্তু নির্ভর করি কিসের ওপর?
৫. প্রিয় নবী (স) কোন্ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন?
৬. মুশরিকের হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেলো কেন?
৭. প্রিয় নবী (স) তাকে কি করলেন?
৮. দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় শক্তি কি?

বিস্তারিত উত্তর দাও ঃ

১. মহান আল্লাহ ক্ষমতা, যোগ্যতা ও বুদ্ধিজ্ঞান আমাদের কেন দিয়েছেন?
২. আমরা কিভাবে আল্লাহর প্রশংসা করি?
৩. আমরা নিজেদের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও বুদ্ধিজ্ঞানের ওপর নির্ভর না করে আল্লাহর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করি কেন?
৪. মুশরিকের হাতে খোলা তলোয়ার দেখেও প্রিয় নবী (স) নিশ্চিন্ত ছিলেন কেন?
৫. যারা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতায় অবিচল থাকে আল কুরআনে তাদের সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

অমায়িক ব্যবহার

নাসির উদ্দীন হিন্দুস্তানের একজন বড় বাদশাহ ছিলেন। নিজের সংসার খরচ ও পরিবার পরিজনদের জন্য তিনি রাজকোষ থেকে একটি পয়সাও নিতেন না। রাজকোষের সমুদয় অর্থসম্পদকে প্রজা সাধারণের সম্পত্তি মনে করতেন। কুরআন শারীফ লিখে অর্থ উপার্জন করতেন এবং তা দিয়ে সংসার চালাতেন।

সে যুগে আজকের মতো প্রেস-ছাপাখানা ছিলনা। এক দিনে হাজার হাজার বই মেশিনে ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি হতো না। হাতে লেখা বই বাজারে বিক্রি হতো। একজন একটা বই লিখতো কয়েকদিন বা মাস ধরে। এজন্য হাতের লেখা সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন ছিল। বাদশাহর হাতের লেখাও সুন্দর ছিল।

তাঁর সংসারে কোনো রাজকীয় জাঁকজমক ছিলনা। কোনো দাসী চাকরও ছিলনা। বেগম নিজেই রান্নাবান্না করতেন। নিজেই সংসারের যাবতীয় কাজ কাম করতেন।

বাদশাহ নাসির উদ্দীনের অমায়িক ব্যবহার প্রজা সাধারণকে মুগ্ধ করেছিল। একদিন দিল্লীর একজন আমীর এলেন তাঁর সাথে দেখা করতে। আমীরকে তিনি নিজের হাতে লেখা সদ্য সমাপ্ত একটি কুরআন শরীফ দেখালেন। আমীর কুরআন শরীফটি হাতে নিয়ে অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন। মনের আনন্দে তিনি কুরআন শরীফটির এখান থেকে ওখান থেকে কিছু কিছু আয়াত পড়তে থাকলেন। কিছু দুর পড়ার পর বললেন, এর মধ্যে কয়েক জায়গায় ভুল আছে, ওগুলো সংশোধন করে নেবেন।

বাদশাহ আমীরকে ভুলগুলো চিহ্নিত করতে বললেন। আমীর সেগুলো দেখিয়ে দিলেন। বাদশাহ দেখলেন সেগুলো মোটেই ভুল নয়। সবই ঠিক আছে। তবুও তিনি একটুও বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। বরং মুচকি হেসে আমীরকে ধন্যবাদ জানালেন। ভুলগুলো পরে শুধরিয়ে নেবার জন্য সেগুলোর পাশে দাগ দিলেন।

বাদশাহর দরবারে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সামান্য একজন আমীরের সাথে বাদশাহর এই অমায়িক ব্যবহারে বিস্মিত হলেন।

আমীর খুশি হয়ে চলে গেলেন। আমীর চলে যাওয়ার পর বাদশাহ দাগগুলো মুছে ফেললেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

'আমি জানি এর মধ্যে একটাও ভুল নয়। তবুও আমি সবার সামনে নিজের মেহমানকে লজ্জা দিতে চাইনি। তাই তিনি বলার সাথে সাথে নিজের ভুল স্বীকার

করে নিয়ে আমি তার পাশে দাগ দিয়েছি। এখন তিনি চলে যাওয়ার পর দাগগুলো মুছে ফেললাম।'

লোকেরা বাদশাহর ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। হিন্দুস্তানের বিরাট অঞ্চলের ওপর যে বাদশাহর শাসন চলে তিনি দিল্লীর সামান্য একজন আমীরকে খুশি করার জন্য তাঁর সাথে যে অমায়িক ব্যবহার করলেন তা দরবারের সবাইকে প্রভাবিত করলো।

শুধু বন্ধুর সাথে নয়, শত্রুর সাথেও আমাদের অমায়িক ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় এ ধরনের অমায়িক ব্যবহারে অনেক পুরাতন শত্রুও তার শত্রুতা ভুলে বন্ধু হয়ে যায়। কারণ এই ধরনের ব্যবহারের মধ্যে একটা শক্তি থাকে। এই শক্তি সহজে শত্রুকে পরাস্ত করে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি যদি কারোর অসৎ কাজের জবাবে সবচেয়ে ভালো কাজটা করো, তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে তোমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু হয়ে গেছে।

তাই যে আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে আমরা তার সাথে ভালো ও অমায়িক ব্যবহার করবো। আমাদের মনে রাখতে হবে শয়তান সব সময় আমাদের খারাপ ব্যবহার করার প্ররোচনা দেয়। শয়তানের প্ররোচনার ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে।

একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বসে ছিলেন।

এমন সময় মুশরিকদের এক ব্যক্তি সেখানে এলো এবং হযরত আবু বকরকে (রা) আজে বাজে গালিগালাজ করতে থাকলো।

হযরত আবু বকর (রা) চুপচাপ তার গালাগালি শুনতে লাগলেন। কোন জবাব দিলেন না। প্রিয় নবী (স) তাঁর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললেন। জবাবে তিনিও তাকে একটি কড়া কথা বলে ফেললেন।

হযরত আবু বকরের (রা) মুখ থেকে ঐ কড়া কথাটি বের হবার সাথে সাথেই প্রিয় নবীর (স) চেহারায় বিরক্তিভাব ফুটে উঠলো। তিনি তখনই উঠে চলে গেলেন।

হযরত আবু বকরও (রা) উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন। পথি মধ্যে তিনি প্রিয় নবীকে (স) জিজ্ঞেস করলেন,

ব্যাপারটি কি? সে যখন আমাকে গালি দিচ্ছিল তখন আপনি মুচকি হাসছিলেন। আর যখনই আমি তার জবাব দিলাম অমনি আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে এলেন?

প্রিয় নবী (স) বললেন, তুমি যতক্ষণ চুপচাপ ছিলে ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার সাথে ছিল। ফেরেশতা তোমার পক্ষ থেকে তার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু যখনই তুমি নিজেই জবাব দিলে তখন ফেরেশতার স্থানটি শয়তান দখল করে নিল। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারিনা।

তাই বন্ধু হোক শত্রু হোক সবার সাথে অমায়িক ব্যবহারের চাইতে ভালো আর কিছু নেই।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. বাদশাহ নাসির উদ্দীন কুরআন শরীফ লিখে অর্থ উপার্জন করতেন কেন?
২. বাদশাহ নাসির উদ্দীনের সংসারের কাজকাম কে করতো?
৩. আমীর বাদশাহর কুরআন শরীফ পড়ার পর কি বললেন?
৪. আমীর চলে যাওয়ার পর বাদশাহ দাগগুলো মুছে ফেললেন কেন?
৫. পুরাতন শত্রুও কিভাবে বন্ধু হয়ে যায়?
৬. শয়তান আমাদের সবসময় কোন্ ধরনের প্ররোচনা দেয়?
৭. হযরত আবু বকর (রা) যখন মুশরিকের গালাগালির জবাব দিচ্ছিলেন না তখন প্রিয় নবী (স) কি করছিলেন?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. বাদশাহ নাসির উদ্দীনের গৃহে কোনো চাকর চাকরানী ছিলনা কেন?
২. বাদশাহ আমীরের সাথে কি অমায়িক ব্যবহার করলেন?
৩. শুধু বন্ধুর সাথে নয়, শত্রুর সাথেও আমাদের অমায়িক ব্যবহার করতে হবে কেন? এ ব্যাপারে কুরআন কি বলে?
৪. মুশরিকের গালাগালির জবাবে হযরত আবু বকর (রা) কি করলেন? এর ফল কি হলো?
৫. এই গল্প থেকে তুমি কি উপদেশ গ্রহণ করলে?

জীবনের চেয়ে নামায বড়

হিন্দুস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী মোগল বাদশাহ ছিলেন আওরঙ্গজেব আলমগীর। তাঁর সময় সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বেশী এলাকা একই রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়। এর আগে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব হিন্দুস্তান সব সময় বহু স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তিনি এগুলোকে একসাথে গেঁথে এক হিন্দুস্তানের স্বপ্ন গড়ে তোলেন। তিনি পঞ্চাশ বছর রাজ্য শাসন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সাহসী যোদ্ধা, কুশলী সেনাপতি ও বিচক্ষণ শাসক।

বাদশাহ আকবর তাঁর রাজত্ব কালে সমগ্র হিন্দুস্তানে যে বে-দীনী ছড়িয়ে ছিলেন আওরঙ্গজেব বহুলাংশে তার মুলোৎপাটন করেন। এটিই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। আকবরের তথাকথিত 'দীন ইলাহী' ইসলাম ও মুসলিম সমাজের ওপর বিরাট আঘাত হেনেছিল। আওরঙ্গজেবের পঞ্চাশ বছরের শাসন সে আঘাত থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ ও কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। এত বড় রাজ্যের সমস্ত কাজ কাম নিজে সরাসরি দেখাশুনা করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে সশরীরে সৈন্য পরিচালনা করতেন।

তিনি অত্যন্ত সরল ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন। শরীয়তের প্রত্যেকটি নির্দেশ মেনে চলতেন। আলেম সমাজকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। নিজের সংসার খরচের জন্য রাজকোষ থেকে একটি পয়সাও নিতেন না। টুপি সেলাই করে ও কুরআন শরীফ লিখে সংসার খরচ নির্বাহ করতেন। নামায কখনো কাযা করতেন না।

তাঁর যৌবনকালের একটি ঘটনা। তখনো তিনি বাদশাহ হননি। পিতা বাদশাহ শাহজাহান তাঁকে কাবুলে একটি যুদ্ধে পাঠালেন। তখন হিন্দুস্তানের উত্তর পশ্চিম দিকে আফগানিস্তান নামে কোনো দেশ ছিল না। বরং তার জায়গায় ছিল কাবুল, কান্দাহার, গজনী, হিরাত ইত্যাদি রাজ্য। এগুলো অনেক পরে আফগানিস্তান নাম গ্রহণ করে। কাবুল তখন হিন্দুস্তানের সাথে যুক্ত ছিল। পাহাড় পর্বতে ঘেরা

রাজ্যটিতে বাস করতো অনেকগুলো যোদ্ধা জাতি ও উপজাতি। তারা যুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। এদিকে আওরঙ্গজেবও ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিজে উপস্থিত থাকতেন। সেনাবাহিনীর তদারকি ও পরিচালনা সবই নিজ হাতে করতেন। তা ছাড়া তার পূর্বপুরুষরা এই এলাকার অধিবাসী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের জন্ম হিন্দুস্তানে হলেও কাবুলের এই এলাকার সাথে তাঁদের যোগাযোগ ও যাতায়াত ছিল। কাজেই এই এলাকার যোদ্ধারা কি পরিমান দুর্ধর্ষ এবং মরণ পণ করে লড়াই করে তা তিনি জানতেন।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। উভয় পক্ষের আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণে যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করলো। চারদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি, তীরের শন্‌শন্‌ আওয়াজ এবং আল্লাহু আকবর ধ্বনি শ্রুত হতে লাগলো। মনে হচ্ছিল যেন উভয় পক্ষ কেবল মৃত্যুর জন্য লড়াই করছে।

ইতিমধ্যে নামাযের সময় উপস্থিত হলো। আওরঙ্গজেব কখনো নামায কাযা করতে পারেন না। তিনি যুদ্ধের ময়দানেই নামাযের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। তড়িৎগতিতে নেমে পড়লেন হাতির পিঠ থেকে। অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় সেখানেই নামায শুরু করে দিলেন। চতুর্দিক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তলোয়ার ও বর্শার শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিল। মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছিল। তার কোনো পরোয়া না করে মর্দে মুমিন আওরঙ্গজেব এক মনে এক দিলে তাঁর প্রভু মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে হাজিরা দিচ্ছিলেন। ওদিকে মরণপণ যুদ্ধ চলছিল আর এদিকে মর্দে মুমিন আল্লাহর বান্দা আওরঙ্গজেব আল্লাহর সামনে সিজদায় নত হয়ে তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলছিলেন- 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' হে আমার প্রভু, তুমি সমস্ত ভুল, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অভাব, দুর্বলতা, অক্ষমতা মুক্ত। তুমি আমার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী প্রভু।

মুহূর্তের মধ্যে মর্দে মুমিন আওরঙ্গজেব আলমগীর দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু ঘটছে সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। যেন তিনি এক ভয়াবহ যুদ্ধের ময়দানে নেই। তিনি চলে গেলেন তাঁর মহান প্রভু আল্লাহর সামনে। কোথায় কি ঘটছে তার কোনো পরোয়া তাঁর নেই। নিজের জীবনের জন্য তাঁর মনে একটুও শংকা

জাগলোনা। যুদ্ধে জয় পরাজয়কে কোনো গুরুত্ব দিলেন না। নামাযের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেলো সব কিছু।

শত্রু পক্ষ এই মর্দে মুজাহিদের হিম্মত দেখে অবাক হয়ে গেলো। তারা ভীত হলো। নিজেদের বিজয় অসম্ভব মনে করলো। তারা ভাবলো, এতবড় খোদাভীরু, দৃঢ় প্রত্যয়ী মর্দে মুজাহিদকে কোনোদিন পরাজিত করা যাবে না, যে যুদ্ধের বিভীষিকাকে তুচ্ছ করে একমনে নামাযে মশগুল হতে পারে। তাদের সেনাপতি নিজেদের পরাজয় মেনে নিলেন। আওরঙ্গজেবের কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেন।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. আওরঙ্গজেব কত বছর রাজ্য শাসন করেন?

২. আওরঙ্গজেবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কি ছিল?

৩. আওরঙ্গজেবের আমলে আফগানিস্তান এলাকায় কি কি রাজ্য ছিল?

৪. আওরঙ্গজেব কোথায় যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন?

৫. আওরঙ্গজেব কিসের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন?

৬. সেযুগের কয়েকটা যুদ্ধাস্ত্রের নাম বলো?

৭. নামাযের মধ্যে একজন মর্দে মুমিন কোথায় চলে যায়?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. এক হিন্দুস্তানের স্বপ্ন কে গড়ে তোলেন? কেমন করে গড়ে তোলেন?

২. আওরঙ্গজেব কোথায় যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন? সে এলাকার অধিবাসীদের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল?

৩. যুদ্ধক্ষেত্রে আওরঙ্গজেব নামায পড়ার সাহস করলেন কেমন করে?

৪. সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা বলতে কি বুঝ?

৫. শত্রুপক্ষ আওরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করলো কেন?

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম মক্কা শহরে। সেখানেই তিনি বড় হন এবং চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। নবুওয়াত লাভ করার পর তের বছর ধরে তিনি মক্কার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে। বেশির ভাগ লোকই তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। এমন কি তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

অবশেষে তিনি পার্শ্ববর্তী শহর মদীনায় চলে যান। মদীনার লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে। তারা মুসলমান হয়ে যায়। মদীনায় তিনি একটি ইসলামী সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। তাঁর সাহাবাগণ সবাই মদীনায় জমায়েত হয়ে যান। মদীনা একটি ইসলামী জ্ঞানের শহরে পরিণত হয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আনা মদীনাতুল ইল্‌ম' আমি জ্ঞানের শহর।

জ্ঞান হচ্ছে ইসলাম। আর ইসলামের এই জ্ঞান দান করেছেন প্রিয় নবী (স) নিজেই। সাহাবাগণ তাঁর কাছ থেকে এই ইসলামের জ্ঞান লাভ করেছেন। সাহাবাগণ সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকতেন। তাঁর মুখের যে কোনো কথা তাঁরা সংগে সংগেই মুখস্ত করে ফেলতেন এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিতেন। তাঁর যে কোনো কাজের প্রতি তাঁরা লক্ষ্য রাখতেন। তিনি যেভাবে যে কাজটি করতেন তাঁরাও সেভাবে সে কাজটি করতেন। প্রিয় নবীর এই সমস্ত কথা ও কাজ সাহাবাগণ মুখস্থ ও স্মরণ করে রাখেন। পরবর্তীকালে এগুলো বই আকারে লিখিত হয়। এগুলোকে বলা হয় হাদীস। আল্লাহর বাণী কুরআন এবং প্রিয় নবীর (স) কথা ও কাজ এই হাদীস এগুলোই হচ্ছে ইসলামের জ্ঞান।

প্রিয় নবীর (স) ইন্তিকালের পর সাহাবাদের যুগ শুরু হয়। সাহাবাগণের পর শুরু হয় তাঁদের ছাত্রবৃন্দ তাবেয়ী ও তাবাতাবেয়ীদের যুগ। এই যুগে দলে দলে লোকেরা মদীনায় আসতে থাকে ইসলামের জ্ঞান আহরণ করার জন্য। প্রিয় নবী (স) কি বলেছেন এবং কি করেছেন তা সঠিক ভাবে জানার জন্য সারা দুনিয়ার মুসলমানরা উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কাজেই প্রিয় নবীর (স) জ্ঞানের শহর মদীনা তখন ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এ সময় মদীনায় একজন বিশিষ্ট আলেমের আবির্ভাব হয়। দুনিয়া জোড়া তাঁর খ্যাতি। তাঁর নাম ইমাম মালিক (র)। তাঁর কাছে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান লাভ করার জন্য ছাত্ররা আসতে থাকে দূর দূরান্ত থেকে।

একদিন তিনি হাদীস পড়াচ্ছিলেন। ছাত্ররা উস্তাদের বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনছে। এমন সময় আওয়াজ উঠলো হাতি! হাতি!

আর হাতি একটি বিরল প্রাণী। পথে ঘাটে সচরাচর হাতি দেখা যায় না। তাই হাতি দেখার আগ্রহ কমবেশী সবার মধ্যে প্রবল। কাজেই নিমেষে ক্লাশ ফাঁকা হয়ে গেলো। ছাত্ররা সবাই হাদিস পাঠ বন্ধ রেখে হাতি দেখার জন্য হুটোপুটি করে বাইরে বের হয়ে এলো। কিন্তু সুদূর ইউরোপের স্পেন থেকে আগত একজন ছাত্র ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন যথারীতি ক্লাশের মধ্যে বসে রইলেন। হাদীস পাঠ থেকে তার মনোযোগ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতে রাজি হলেন না। ইয়াহ্ইয়ার দীনি ইল্‌ম শিক্ষা করার আগ্রহ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি একমনে উস্তাদের বক্তব্যগুলো লিখে সেগুলো আবার পড়ে দেখছিলেন। বাইরের আওয়াজ তার কানেই আসেনি।

হঠাৎ ইমাম মালিক বললেন, 'প্রিয় পুত্র! তুমি বসে রইলে কেন? সবাই হাতি দেখতে গেলো। স্পেনে তোমাদের এলাকাতেও তো হাতি নেই। তুমিও যাও হাতি দেখে এসো।' ইয়াহ্ইয়া জবাব দিলেন,

'শ্রদ্ধেয় উস্তাদজী! আমি বহুদূর স্পেন থেকে অনেক কষ্ট করে আপনার কাছে এসেছি দীনি ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য, হাতি দেখার জন্য নয়। হাতি দেখার জন্য এখনও জীবনে অনেক সময় রয়ে গেছে।'

ছাত্রের কথা শুনে ইমাম মালিক চমৎকৃত হলেন। তিনি ইয়াহ্ইয়াকে অনেক দোয়া দিলেন এবং বললেন, 'তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। আল্লাহ তোমাকে জ্ঞান জগতে সাফল্য দান করবেন।'

উস্তাদের এই দোয়া আল্লাহ কবুল করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন স্পেনের শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী আলেমগণের অন্যতম হয়েছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে বুখারী শরীফের পাশাপাশি ইমাম মালিকের মুআত্তা হাদীস গ্রন্থটির মর্যাদা। আর এই মুআত্তার মুল বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছেন।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. প্রিয় নবী (স) মক্কায় কত বছর দাওয়াত দিতে থাকেন?

২. হাদীস কাকে বলে?

৩. লোকেরা কখন ইসলামী জ্ঞান লাভ করার জন্য দলে দলে মদীনায় আসতে থাকে?

৪. দুনিয়া জোড়া খ্যাতি সম্পন্ন মদীনার বিশিষ্ট আলেমের নাম কি?

৫. ছাত্ররা হাতি দেখার জন্য পড়া বন্ধ করে সবাই বাইরে বের হয়ে এলো কেন?

৬. একমাত্র কে বাইরে বের হয়ে আসেনি?

৭. উস্তাদ তার জন্য কি দোয়া করেছিলেন?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. প্রিয় নবী (স) নিজেকে জ্ঞানের শহর বলেন, এর অর্থ কি?

২. মদীনা কিভাবে ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়?

৩. ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন সবার সাথে হাতি দেখতে বের হলেন না কেন?

৪. মুআত্তা হাদীস গ্রন্থ সম্পর্কে আরো কিছু কথা জানা থাকলে বলো।

উত্তম সবর

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন প্রিয় সাহাবীর নাম ছিল আবু তালহা (রা)। তাঁর স্ত্রী ছিলেন একজন অত্যন্ত সদগুণ সম্পন্না মহিলা। তিনি সর্বদা আল্লাহর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাকতেন। তাঁদের একটি শিশুপুত্র ছিল। ছেলেটিকে তাঁরা খুব ভালবাসতেন।

একদিন ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লো। কিছুদিন রোগভোগের পর একদিন হঠাৎ ছেলেটি মারা গেলো।

প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের মন হাহাকার করে উঠলেও আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সোপর্দ করলেন। তিনি সবর করলেন। তিনি জানতেন সবরের চাইতে উত্তম আর কিছুই নেই। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনের জন্য আনন্দের কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে, এতে তার মংগল হয়। আবার ক্ষতিকর কোনো কিছু হলে সে সবর করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। তাই তিনি আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে সবর করলেন।

হযরত আবু তালহা (রা) কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর খবর পাননি। তাঁর স্ত্রী প্রতিবেশীদের বলে রেখেছিলেন হযরত আবু তালহা (রা) ফিরে এলে কেউ যেন তাঁকে ছেলের মৃত্যুর খবর না দেয়। কি জানি সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরে আসার পর হঠাৎ প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যুর খবর শুনে স্বামীর কোনো ক্ষতি হতে পারে এই ভয়ে তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন।

সন্ধ্যার পর হযরত আবু তালহা (রা) বাড়ি ফিরলেন। সারাদিন পরিশ্রম করার পর তখনো তাঁর খাওয়া দাওয়া হয়নি। তিনি প্রথমে অসুস্থ ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, ছেলে কেমন আছে?

স্ত্রী জবাব দিলেন, ছেলে আগের চাইতে অনেক শান্তিতে আছে।

হযরত আবু তালহা (রা) নিশ্চিন্ত মনে আহার শেষ করলেন। তারপর শয়ন করলেন। সকালে স্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে জিজ্ঞেস করলেন।

আচ্ছা বল দেখি, যদি কেউ তোমাকে কোনো জিনিস ধার দেয় এবং সময় শেষ হবার পর তার জিনিস ফেরত চায়, তাহলে তুমি কি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করবে?

হযরত আবু তালহা (রা) জবাব দিলেন, তা কেমন করে হতে পারে? তার জিনিস সে ফেরত নেবে। আমি তা আটকে রাখবো কেন?

স্ত্রী বললেন, তাহলে তোমার কাছে আল্লাহ্ যে শিশু পুত্রটি আমানত রেখেছিলেন তার সময় শেষ হবার পর তিনি তাকে ফেরত নিয়েছেন। তার জন্য সবর করো।

হযরত আবু তালহা বুকে হাত চেপে সবর করলেন। ছেলের কাফন দাফন শেষ হওয়ার পর তারা স্বামী-স্ত্রী প্রিয় নবীর (স) কাছে গিয়ে সব ঘটনা বললেন। প্রিয় নবী (স) তাদের সবর দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলেন।

আল্লাহ্ তাদের সবরের পুরস্কার স্বরূপ তাদের আর একটি পুত্র সন্তান দান করলেন।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. আবু তালহা (রা) কে ছিলেন?

২. আবু তালহার (রা) ছেলেটি কখন মারা গিয়েছিল?

৩. পিতা কখন পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পান?

৪. আমানত কাকে বলে?

৫. আল্লাহ্ তাদের সবরের কি পুরস্কার দিলেন?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. পুত্রের মৃত্যুর পর আবু তালহার (রা) স্ত্রী কিভাবে সবর করলেন?

২. আবু তালহার (রা) স্ত্রী স্বামীকে সংগে সংগেই পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিলেন না কেন?

৩. সকালে স্ত্রী স্বামীকে কিভাবে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিলেন?

৪. সবর কাকে বলে? একজন মুমিন কি ভাবে সবর করে?

ওয়াদা পালন

আমরা একে অন্যের সাথে কথা বলার সময় কাউকে বলি, তোমার একাজটা আমি করে দেবো, এটাকে বলা হয় ওয়াদা। এই ওয়াদা অনেক সময় আমরা মুখে মুখে করি আবার অনেক সময় লিখিত আকারে করি। মুখে হোক বা লিখিত এর গুরুত্ব সব সময় সমান।

সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি ওয়াদা করে তা পালন করার চেষ্টা করে। আর ওয়াদা পালন করার মানে হচ্ছে, যে ভাবে কথা দেয়া হয়েছিল ঠিক সেভাবে কাজটা করা। যেমন কাউকে বলা হয়েছিল, আমি তোমাকে আগামীকাল একশত টাকা দেবো। কিন্তু টাকাটা আগামীকাল না দিয়ে তার পরের দিন দেয়া হলো। অথবা আগামীকাল দেয়া হল কিন্তু একশত টাকা নয়, পঞ্চাশ টাকা।

এটাকে ওয়াদা পালন বলা হবে না বরং ওয়াদা ভংগের মধ্যে এটা শামিল হবে। তাই ওয়াদা পালন করার ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা ওয়াদা পালন করো। কিয়ামতের দিন ওয়াদা পালন করার ব্যাপারে আল্লাহ্ কড়া হিসেব নেবেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকের একটি দোষ বলেছেন, সে ওয়াদা করলে ওয়াদা ভংগ করে। মুনাফিক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে বাইরে বাইরে নিজেকে মুসলমান দেখায় এবং মুসলমানের মতো কাজকাম করে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইসলামের শত্রু এবং ইসলামের শিকড় কেটে চলে। এবার ওয়াদা পালনের ব্যাপারে প্রিয় নবীর (স) একটি ঘটনা শোনো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো নবী হননি। নবী না হলে কি হবে শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সৎ। যুবকদের মধ্যে তাঁর মতো চরিত্রবান আর কেউ ছিলনা। তাঁর স্বভাব-চরিত্র, কাজ কারবার ও মানুষের সাথে লেনদেনের মধ্যে অন্যায়ের চিহ্নমাত্রও ছিলনা। তিনি ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এক্ষেত্রেও তিনি একজন সৎ ব্যবসায়ী বলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। মানুষের সাথে ওয়াদা করলে তিনি নিজের সর্বস্ব দিয়েও তা পালন করতেন।

একবারের কথা বলছি। তখন তিনি প্রায়ই আবদুল্লাহর সাথে মিলে ব্যবসা করতেন। এ ব্যাপারে সাথী আবদুল্লাহর সাথে তাঁকে প্রায়ই লেনদেন করতে হতো। একদিন কিছু মালপত্র কেনাবেচার ব্যাপারে আবদুল্লাহর সাথে তাঁর কিছু লেনদেন হলো। লেনদেনের ব্যাপারটি চলছিল, এমন সময় আবদুল্লাহকে কোনো জরুরী কাজে বাইরে যেতে হলো। কাজেই লেনদেনের ব্যাপারটি অসমাপ্ত রয়ে গেলো।। আবদুল্লাহ তাঁকে পথের একস্থানে বসিয়ে রেখে বললো ঃ আপনি অনুমতি দিলে আমি একটু জরুরী কাজটি সেরে আসি। প্রিয় নবী (স) তার ফিরে আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করার ওয়াদা করলেন।

প্রিয় নবী (স) পথের ধারে বসে রইলেন। ওদিকে আবদুল্লাহ নিজের ওয়াদা ভুলে গেলো। নিজের কাজে সে তিন দিন ব্যস্ত রইলো। তিন দিন পর নিজের ওয়াদা মনে পড়লো। সে দৌড়ুতে দৌড়ুতে সেস্থানে এসে উপস্থিত হলো। প্রিয় নবী তখনো তার অপেক্ষায় সেখানে বসে আছেন। আবদুল্লাহ নিজের ভুলের দরুন ভীষণ লজ্জিত হলো। কিন্তু প্রিয় নবীর (স) কপালে একটি বিরক্তির রেখাও দেখা গেলোনা। তিনি কেবল এতটুকু বললেনঃ

"আবদুল্লাহ! তুমি আমাকে বড়ই কষ্ট দিলে। তিন দিন থেকে আমি তোমার অপেক্ষায় এখানে বসে আছি"।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. ওয়াদা কাকে বলে?

২. ওয়াদার গুরুত্ব কেন?

৩. মুনাফিকের দোষ কি?

৪. প্রিয় নবী (স) কি ওয়াদা করেছিলেন?

৫. আবদুল্লাহ কেন লজ্জিত হলো?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. ওয়াদা পালন ও ওয়াদা ভংগের মধ্যে পার্থক্য কি?

২. মুনাফিক কাকে বলে?

৩. প্রিয় নবী (স) কিভাবে আবদুল্লাহর সাথে তাঁর ওয়াদা পালন করেন?

মিতব্যয়িতা

ইসলামের ইতিহাসে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের (র) নাম চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। তিনি একজন বাদশাহ হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদিনের মধ্যে গণ্য করা হয়। হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলীর (রা) খেলাফতী শাসন ও হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের (র) শাসনের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলীফার পর উমাইয়া রাজবংশের বাদশাহী শাসন শুরু হয়। উমর ইবনে আবদুল আজীজ বাদশাহ হওয়ার পরপরই লোকদের বলেন: আমাকে তোমাদের বাদশাহ করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের বাদশাহ হওয়ার যোগ্য নই। তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন যোগ্য লোককে বাদশাহ নির্বাচন করে নাও। লোকেরা সবাই মিলে আবার তাঁকেই বাদশাহ নির্বাচিত করে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন নির্বাচিত বাদশাহ। বাদশাহ হয়েও তিনি ছিলেন খলীফা।

খলীফা ও বাদশাহর মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, খলীফা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন সেভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন এবং তিনি মুসলিম জনগণের মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হন। অন্য দিকে মুসলিম বাদশাহ কুরআন ও হাদীসের অনুগত হলেও নিজের ইচ্ছামত দেশের শাসন পরিচালনা করেন। আবার জনগণ তাঁকে বাদশাহ করেন না। বরং তিনি শক্তির জোরে বাদশাহ হন। বাদশাহর পরে তাঁর ছেলে বাদশাহ হন। খলীফার পর তাঁর ছেলে খলীফা হননা। বরং মুসলিম জনগণ আবার যাকে খলীফা করবেন তিনি খলীফা হবেন। খলীফার এই শাসনকে বলা হয় খিলাফত।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ মাত্র আড়াই বছর রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু এই আড়াই বছরের মধ্যে দেশবাসীর জীবনে আবার খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের বরকত, সমৃদ্ধি ও দীনদারী ফিরে আসে।

বাদশাহ হওয়ার পর তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন সেটি হচ্ছে: তিনি রাজ্যের সমস্ত বিভাগে অপব্যয় বন্ধ করে দেন এবং সরকারের কাছে যাদের যা পাওনা তা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে দিতে থাকেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর বায়তুলমাল বাদশার নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। বাদশাহ তার ইচ্ছামত সেখান থেকে খরচ করতেন। তিনি বায়তুলমালকে আবার জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করেন। ফলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রদেশের বায়তুলমালের অবস্থার অবনতি হতে থাকে।

এ অবস্থায় একদা বসরার গভর্ণর তাঁর নিকট পত্র লিখলেন: আমীরুল মুমেনীন! আমার বায়তুলমালের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এমনকি আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাগজও নেই। কাজেই কাগজ কেনার জন্য কিছু অর্থ পাঠান।

হযরত উমর (র) লিখে পাঠালেন: মিতব্যয়ী হও। আমার পত্র পাওয়ার সাথে সাথে কলমটা আরো সূঁচালো করে নাও এবং কাগজের দু'পিঠে ঘন করে লেখো। আর অতিরিক্ত কাগজ কেনার প্রয়োজন হবে না। আল্লাহ এর মধ্যেই বরকত দেবেন।

তোমরা নিজেরাও মিতব্যয়ী হওয়ার চেষ্টা করো। কেবল অভাব অনটনের সময় মিতব্যয়ী হওয়া নয় বরং সবসময় কাজে মিতব্যয়ী হতে হবে। মিতব্যয়ী মানে হচ্ছে, যে পরিমাণ দরকার সে পরিমান ব্যয় করা। তার কম ব্যয় করাকে আবার কৃপণতা বলে। কৃপণতা ভালো নয়। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যয় করাকে বলা হয় অমিত ব্যয়িতা। অমিতব্যয়িতা ভাল নয়।

মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন, রহমান বা আল্লাহর বান্দা হচ্ছে তারা যারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করেনা এবং কৃপণতাও করেনা। বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ আরো বলেছেন, অপব্যয় করে যারা তারা শয়তানের ভাই।

আর এই অপব্যয় কেবল টাকা পয়সার ক্ষেত্রে নয় বরং সময় ব্যয় করা, কথা বলা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আমাদের অপব্যয় ও অমিতব্যয় থেকে দূরে থাকতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. ইতিহাসে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের (র) নাম চিরদিন অমর হয়ে থাকবে কেন?
২. বাদশাহ্ হবার পর তিনি লোকদের কি বলেন?
৩. তাঁর আড়াই বছরের রাজ্য শাসনে দেশ ও জনগণ কি লাভ করে।
৪. গভর্ণর উমরের (র) কাছে কি পত্র লেখেন?
৫. মিতব্যয়ী কাকে বলে?
৬. কৃপণতা কাকে বলে?
৭. যারা অপব্যয় করে তারা কি?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. খলীফা ও বাদশাহর মধ্যে পার্থক্য কি? বুঝিয়ে বলো।
২. হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের বায়তুলমালের অবস্থার অবনতি হতে থাকে কেন?
৩. অমিতব্যয়িতা দূর করার জন্য তিনি কি নির্দেশ দেন?
৪. মিতব্যয়ী বলতে কি বুঝ?
৫. মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে কাদেরকে রহমানের বান্দা বলেছেন? কেন বলেছেন?

স্পষ্টবাদিতা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের চরিত্র ছিল সকল প্রকার সদগুণে পরিপূর্ণ। তবে তাঁদের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তাঁরা কখনো সত্য কথা বলতে ভয় পেতেন না। প্রিয় নবী (স) বলেছেন: "জালেম শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ।" প্রিয় নবীর (স) সাহাবীগণ তাঁর এই বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এজন্য কোনো জালেমের জুলুমের পরোয়া করেননি। কোনো শাসকের চোখ রাঙানীকে ভয় করেননি। এমনি একটি ঘটনার কথা আজ তোমাদের বলবো। খোলাফায়ে রাশেদীনের ত্রিশ বছরের শাসনকাল শেষ হয়ে তখন সবেমাত্র বনু উমাইয়ার শাসনকাল শুরু হয়েছে। প্রিয় নবীর (স) অনেক সাহাবী তখন বেঁচে আছেন। মারোয়ান মদীনার গভর্ণর। মদীনায় যারা বনু উমাইয়াদের শাসনের বিরুদ্ধে ছিল তাদের উপর সমানে জুলুম চালাচ্ছেন মারোয়ান। সরকারের হুকুমের বিরুদ্ধে কাউকে টুঁশব্দটিও করতে দিচ্ছেননা।

মদীনার লোকেরা মারোয়ানের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলো। তাকে কেউ পছন্দ করতোনা। মারোয়ান মসজিদে নামায পড়াতেন। মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার জন্য লোকেরা তার পেছনে নামায পড়তো। কিন্তু নামাযের পর তিনি কিছু বলতে চাইলে লোকেরা উঠে চলে যেতো। জুমার নামাযের খুতবা হয় নামাযের আগে। খুতবা মানে বক্তৃতা। লোকেরা বাধ্য হয়ে তার খুতবা বা বক্তৃতা শুনতো। কিন্তু ঈদের খুতবা হয় নামাযের পর। কাজেই নামাযের পর নীরবে লোকেরা চলে যেতে থাকতো। মারোয়ানের খুতবা বা বক্তৃতা কেউ শুনতে চাইতো না।

মারোয়ান দেখলেন ঈদের নামাযে তার খুতবার সময় লোকেরা চলে যেতে থাকে। তাই তিনি এক ফন্দি আঁটলেন। তিনি নামাযের আগে খুতবা পড়তে মনস্থ করলেন। তাহলে আর কেউ চলে যেতে পারবে না। লোকেরা তার কথা শুনতে চায়না। তিনি জোর করে তাদেরকে নিজের কথা শুনাবেন। মারোয়ান নামাযের আগে খুতবা

পড়তে উঠলেন। তিনি মনে করলেন তার বিরুদ্ধে কথা বলবে এত বড় বুকের পাটা কার আছে? কিন্তু সংগে সংগেই হযরত আবু সাঈদ (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি নির্ভীক কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন। বললেন: "মারোয়ান! তুমি যত বড় গভর্ণরই হওনা কেন, প্রিয় নবীর (স) তরিকার মধ্যে কোন পরিবর্তন করার অধিকার তোমার নেই। প্রিয় নবী (স) ঈদের নামাযে নামাযের পর খুতবা দিয়েছেন। তুমি নামাযের আগে খুতবা দিতে পারো না।"

মারোয়ান অনেক চেষ্টা করলেন আগে খুতবা দিতে। কিন্তু উপস্থিত জনতার ক্রোধ দেখে তার এরাদা পরিবর্তন করতে হলো। এরপর মারোয়ান আর প্রিয় নবীর (স) কোনো পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা চিন্তাই করতে পারেননি। তার সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা ও পরাক্রম এখানে এসে স্তব্ধ হয়ে যেতো।

মাত্র একজন সাহাবীর স্পষ্টবাদিতা সেদিন ইসলামকে বিরাট বিপর্যয় থেকে বাঁচালো। যদি হযরত আবু সাঈদ (রা) সেদিন জানের পরোয়া না করে প্রতিবাদ না জানাতেন তাহলে হয়তো মুসলিম শাসকরা আজ ইসলামের মধ্যে অনেক রকমের পরিবর্তন ও কাট-ছাঁট করে তার চেহারাই পাল্টে দিতো।

বড় হয়ে ইতিহাস পড়লে তোমরা জানতে পারবে, প্রিয় নবীর (স) সাহাবীদের মতো এ ধরনের সত্যনিষ্ঠ সাহসী লোকের অভাবে সব ধর্ম শুরুতেই তার আসল পথ ছেড়ে অন্য পথে যাত্রা শুরু করেছে। তাই ইসলাম ছাড়া সব ধর্মই আসল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. সাহাবীগণের সবচেয়ে বড় গুণ কি ছিল?

২. প্রিয় নবীর (স) কোন্ বাণী সাহাবীগণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন?

৩. জুমার নামাযে খুতবা কখন হয়? ঈদের নামাযে খুতবা কখন হয়?

৪. মারোয়ান ঈদের নামাযে খুতবা আগে পড়ার চেষ্টা করলেন কেন?

৫. মারোয়ান ঈদের নামাযে খুতবা আগে পড়ার চেষ্টা করলে কে বিরোধিতা করলেন?

৬. মারোয়ানের সমস্ত ক্ষমতা ও পরাক্রম কোথায় এসে স্তব্ধ হয়ে যেতো?

৭. অন্য সমস্ত ধর্ম শুরুতেই বিকৃত হয়ে গেছে কেন?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. জালেম শাসকের সামনে সত্যকথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ- একথার অর্থ কি?

২. মদীনার লোকেরা কিভাবে মারোয়ানের বিরুদ্ধে তাদের বিরক্তি প্রকাশ করেছিল?

৩. হযরত আবু সাঈদ (রা) মারোয়ানের দুষ্ট কর্মকে কিভাবে রুখে দিলেন?

৪. মারোয়ানের চক্রান্ত সফল হলে ইসলামের কি ক্ষতি হতো?

ন্যায়বিচার

মুসলমানরা বারো'শ বছর দুনিয়া শাসন করেন। দুনিয়ার যে দেশই তারা শাসন করেছে সেখানে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে সবার আগে। ইসলামের প্রথম যুগে তো মুসলমানদের ন্যায় বিচারের কোনো তুলনাই ছিলনা। তখন ইসলাম মানেই ছিল ন্যায়বিচার। আল্লাহ নিজেই ন্যায়বিচার ও মানুষের সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, আমি ইনসাফ ও ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের কঠিন দিনে ন্যায়বিচারক শাসক আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে।

মুসলমানদের শাসনের মধ্যযুগেও মুসলিম শাসকদের মধ্যে ন্যায়বিচারের অভাব ছিলনা।

হিন্দুস্তানের একজন বড় বাদশাহ ছিলেন মুহম্মদ তোগলক। তাঁর মতো জ্ঞানী ও বিচক্ষণ বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে খুব কম বসেছে। তিনি নিজে কেবল ন্যায় বিচারক ছিলেন না বরং রাজ্যের ছোট বড় প্রত্যেকটি প্রজা যাতে ন্যায় বিচার লাভ করতে পারে তারও সুব্যবস্থা করেছিলেন।

একদিন তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন দুটি ছেলে ঝগড়া করছে। একজনকে ধনীর ছেলে ও অন্য জনকে গরীবের ছেলে বলে মনে হলো। ধনীর ছেলেটি ধমক দিচ্ছিল, চীৎকার করছিল আর গরীবের ছেলেটি কাঁদছিল। বাদশাহ মনে করলেন ধনীর ছেলেটি গরীবের ছেলেটিকে মেরেছে, তাইতো সে কাঁদছে। তিনি গরীবের ছেলেকে অযথা মারপিট করার জন্য ধনীর ছেলের পিঠে কয়েকটা বেত্রাঘাত করলেন। ধনীর ছেলেটিকে সাবধান করে দেয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলে ধনীর ছেলেটির কোনো দোষ ছিলনা। দোষ ছিল গরীবের ছেলেটির। ধনীর ছেলে তাকে মারপিট করতে পারে এই ভয়েই সে কাঁদছিল। বাদশাহ ভুল বুঝেছিলেন।

ধনীর ছেলেটি নির্দোষ হওয়ার কারণে বাদশার হাতে মার খেয়ে ক্রুদ্ধ হলো। সে বাদশার বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করলো। বাদশাহ আসামীর

কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। বাদশার অপরাধ প্রমাণিত হলো। কাজী তার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন। ইসলামী আইনে আদালতের কাছে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, বাদশাহ্-ফকীর সবাই সমান। কাজেই বাদশাহকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তিনি ধনীর ছেলেকে যে ছড়ি দিয়ে যে কয় ঘা মেরেছেন ধনীর ছেলে সেই ছড়ি দিয়ে সেই কয় ঘা তাঁকে মারবে।

বাদশাহ্ ধনীর ছেলের হাতে ছড়ি দিয়ে বললেন, তোমার প্রতিশোধ নাও। ছেলেটি প্রথমে ইতস্তত করলো। কিন্তু বাদশাহ্ যখন তাকে মারবার জন্য কসম দিলেন তখন সে ছড়ি নিয়ে মারতে প্রস্তুত হলো। ছেলেটি প্রকাশ্য আদালতে সবার সামনে বাদশাহকে একুশ ঘা বেত্রাঘাত করলো। বাদশাহ্ টু শব্দটি করলেন না। একবার মারের চোটে তাঁর শিরস্ত্রাণ মাথা থেকে পড়ে গেলো। তিনি নীরবে সেটি উঠিয়ে আবার মাথায় রাখলেন।

বাদশাহর ন্যায়নিষ্ঠা দেখে উপস্থিত জনতা বিস্ময়ে মুগ্ধ হলো।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. মুসলমানরা কত বছর দুনিয়া শাসন করে?
২. আল্লাহ্ কাদের ভালোবাসেন?
৩. বাদশাহ্ মোহাম্মদ তোগলক কাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন?
৪. আসল দোষী কে ছিল?
৫. কাজী কি বিচার করলেন?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. গরীবের ছেলেটি কাঁদছিল কেন?
২. কাজীর বিচার কিভাবে কার্যকরী হলো?
৩. ইসলামী আইনে আদালতের কাছে সবাই সমান– কথাটি বুঝিয়ে বলো।

অনাড়ম্বর জীবন

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরল ও অনাড়ম্বর জীবন পছন্দ করতেন। বিলাসিতা মোটেই পছন্দ করতেন না। দুনিয়ার সকল প্রকার সুখ ও আরাম উপভোগ করার সুযোগ তিনি লাভ করছিলেন কিন্তু কোনদিন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি।

তিনি খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে শয়ন করতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী হযরত হাফসা (রা) চাটাইটা ভাঁজ করে বিছিয়ে দেন। সকালে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করেন: "রাত্রে আমার বিছানায় কি বিছিয়ে দিয়েছিলে?"

হযরত হাফসা জবাব দেন: "হে আল্লাহর রসূল! সেই চাটাইটা বিছিয়ে দিয়েছিলাম। তবে বিছানাটা একটু নরম করার জন্য সেটাকে চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম।"

প্রিয় নবী (স) বলেন: "না, আগের মতোই বিছিয়ে দিয়ো, রাত্রে নরম বিছানার কারণে আমি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতে পারিনি।"

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) কাপড়ের ব্যবসা করতেন। খলীফা হওয়ার পরও তিনি কাপড়ের গাঁট পিঠে করে নিয়ে বাজারে যেতে থাকেন। পরে খেলাফতের কাজে তাঁর সমস্ত সময় ব্যয় হতে থাকায় লোকেরা তাঁর সংসার খরচের জন্য বায়তুলমাল থেকে একজন সাধারণ লোকের চলার মতো ভাতা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। কোন জাঁকজমকের তাঁর দরকার ছিলনা। খলীফা এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রেসিডেন্ট তথা প্রধান ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হবার কারণে তাঁর কোনো বিশেষ ধরনের পোশাকেরও প্রয়োজন ছিলনা। তাই নিজের খরচের জন্য বেশী টাকাও তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হয়নি। খলীফা উমর ফারুকের (রা) জীবনে বিলাসিতার কথা কল্পনাই করা যায়না। তিনি তালি দেয়া জামা গায়ে দিতেন। কখনো তাঁর জামায় চৌদ্দটা পর্যন্ত তালি দেয়া থাকতো। আবার তার মধ্যে কোনো তালি

হতো চামড়ার। পথ চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কখনো গাছের তলায় মাটিতে শুয়ে বিশ্রাম নিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

অনেক মুসলিম বাদশাহও সোনা-হীরা-জহরতের মধ্যে বাস করেও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। হিন্দুস্তানের বাদশাহ নাসিরুদ্দীনের স্ত্রী নিজের হাতে রান্না করতেন। একদিন রান্না করতে গিয়ে তাঁর হাত পুড়ে যায়। তিনি বাদশাহর কাছে নিজের কষ্টের জন্য অভিযোগ করেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন পাচিকা রাখতে বলেন। কিন্তু বাদশাহ জবাব দেন: "পাচিকার বেতন দেয়ার মত অর্থ আমার নেই। বায়তুলমাল জনসাধারণের সম্পত্তি। তাতে আমার কোনো অধিকার নেই। কুরআন শরীফ লিখে সামান্য যা কিছু অর্থ আমি উপার্জন করি তাই দিয়ে আমাকে সংসার চালাতে হয়।"

প্রিয় নবী (স) বলেন: "আমি দেখতে পাচ্ছি, ইসরাফীল সিংগায় মুখ দিয়ে মাথা নীচু করে কান পেতে সিংগায় ফুঁক দেবার জন্য আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করছে, (আর সিংগায় ফুঁক দিলেই সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে)। এ অবস্থায় আমি কেমন করে আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করতে পারি?"

ইসরাফীল সিংগায় ফুঁক দেবার পর কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। কিয়ামতের ময়দানে মানুষের সমস্ত কাজের বিচার হবে। সেখানে বিচারক হবেন একমাত্র আল্লাহ। আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করে যে সম্পদ আমরা বিনষ্ট করি তারও হিসেব দিতে হবে। সেদিন হিসেব দেয়া হবে বড়ই কষ্টকর। বিশেষ করে যারা জাতির শাসক ও কর্মকর্তা তাদের জন্য আরো বেশি কষ্টকর।

তাই বিশেষ করে মুসলিম শাসক ও জাতির কর্মকর্তাদের বিলাসী ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. প্রিয় নবী (স) কিসের ওপর শয়ন করতেন?
২. প্রিয় নবী (স) রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠতে পারেননি কেন?
৩. খলীফা হবার পর হযরত আবুবকর (রা) কিভাবে কাপড়ের ব্যবসা করতেন?
৪. খলীফা উমরের (রা) জামায় কয়টি তালি দেয়া থাকতো?
৫. বাদশাহ্ নাসিরুদ্দীনের স্ত্রীর হাত পুড়ে যায় কেন?
৬. ইসরাফীল সিংগায় মুখ দিয়ে বসে আছেন কেন?
৭. কিয়ামত কি?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. দুনিয়ার সকল সুখ ও আরাম উপভোগ করার সুযোগ থাকার পর তবুও প্রিয় নবী (স) কেন বিলাসী জীবন যাপন করেননি?
২. মুসলিম জাহানের খলীফার জন্য একজন সাধারণ প্রজার চলার মতো ভাতা কেন বরাদ্দ করা হয়?
৩. বাদশাহ্ নাসিরুদ্দীনের স্ত্রী পাচিকা রাখতে বলায় তিনি কি জবাব দেন?
৪. আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করা উচিত নয় কেন?

সত্যের সংগ্রামে আগ্রহ

নবুওয়াত লাভ করার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফেরদেরকে সত্যের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাদেরকে নিজেদের হাতে গড়া মিথ্যা দেবদেবীর পূজা করতে নিষেধ করেন। মানুষের তৈরি যেসব মূর্তি কথা বলতে পারেনা, যাদের কোনো কিছু করার এমনকি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার ক্ষমতা নেই, তাদেরকে ত্যাগ করে একমাত্র ইলাহ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদত বন্দেগী করার আহবান জানান।

কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক লোক তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। বেশির ভাগ লোক তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। তারা তাঁকে ও তাঁর সংগী সাথীদেরকে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে থাকে। একসময় কাফেরদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানেও কাফেররা তাঁকে শান্তিতে বাস করতে দিলনা। তারা সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে লাগলো। একবার কাফেররা এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলো। এ খবর মদীনায় এসে পৌঁছলো। মদীনায় যুদ্ধের প্রস্তুতি চললো। প্রিয় নবী (স) তাঁর সাহাবাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে লাগলেন। পুরুষ নারী যুবক কিশোর সবাই এগিয়ে এলো। সবাই ইসলামের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কেউ কারোর থেকে পেছনে থাকতে চায় না। প্রিয় নবী (স) কিশোরদের বিদায় দিয়ে দিলেন। তিনি বললেন: "তোমরা এখনো ছোট। আরো একটু বড় হও। তখন তোমাদের যুদ্ধে শরীক করা হবে।"

কিন্তু কিশোররা তাতে মোটেই দমলোনা। তাদের আগ্রহ একটুও কমলোনা। তারা সেনা বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলো। তাদের মধ্যে রাফের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী। প্রিয় নবী (স) লম্বায় ছোট হওয়ার কারণে তাকে বিদায় দিয়ে ছিলেন। কিন্তু সে এক বুদ্ধি আঁটলো। অন্য দিক থেকে ঘুরে এসে দু'পায়ের পাঞ্জার উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বললোঃ

"হে আল্লাহর রসূল! আমি ছোট নই। দেখুন আমি কত বড়। আমার তলোয়ার দিয়ে আমি অনায়াসে শত্রু ধ্বংস করতে পারবো।"

প্রিয় নবী (স) তার আগ্রহ দেখে তাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিলেন। রাফেকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে দেখে কিশোরদের দলে চাঞ্চল্য দেখা দিল। আর একটি কিশোর এগিয়ে এলো। তার নাম ছিল সামরা। সে রাফের চাইতেও ছোট ছিল। সে বললঃ

"হে আল্লাহর রসূল! আমাকেও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিন। আমি ছোট হলে কি হবে রাফের চাইতে আমার শক্তি বেশী। আর যুদ্ধ তো শক্তির জোরেই হয়। সন্দেহ হলে রাফের সাথে কুস্তি লড়ে আমি দেখিয়ে দিতে পারি।"

প্রিয় নবী (স) সামরার কথা মেনে নিলেন। দু'জনের মধ্যে কুস্তি হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সামরা রাফেকে ধরাশায়ী করলো। ফলে সামরাও মুসলিম সেনাবাহিনীতে স্থান পেলো।

আল্লাহ এই নি:স্বার্থ মুজাহিদগণের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. মক্কায় প্রিয় নবীর (স) সত্যের দাওয়াতে কি পরিমাণ লোক সাড়া দেয়?
২. কাফেরদের অত্যাচারে তিনি কোথায় চলে যান?
৩. প্রিয় নবী (স) কিশোরদের যুদ্ধে শামিল করলেন কেন?
৪. রাফে কিভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করলো?
৫. সামরা কিভাবে রাফেকে পরাস্ত করলো?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. প্রিয় নবীর (স) সত্যের দাওয়াত কি ছিল?
২. কিশোররা কিভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার জন্য তাদের আগ্রহ প্রকাশ করছিল? নিজের ভাষায় বুঝিয়ে বলো।

গোপনীয়তা রক্ষা করা

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বড় সাহাবী ছিলেন। তাঁর মা বাল্যাবস্থায় তাঁকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সোপর্দ করে যান। তখন থেকেই তিনি সব সময় প্রিয় নবীর (স) কাছে থেকেছেন। সারাদিন তাঁর কাছে থেকেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁর কাজ করে দিয়েছেন। তারপর রাত হলে মায়ের কাছে চলে গিয়েছেন। আবার পরের দিন সকালে চলে এসেছেন। এভাবে তিনি প্রিয় নবীর (স) কাছে থেকে তাঁর স্নেহে লালিত পালিত হয়ে বড় হয়েছেন। হযরত আনাসের (রা) ছেলেবেলাকার একটি ঘটনার কথাই আজ বলবো।

একদিন তিনি ছেলেদের সাথে পথে খেলা করছিলেন। প্রিয় নবী (স) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছেলেদের সালাম করলেন। তারপর আনাসকে (রা) কাছে ডাকলেন। তাকে নিজের একটা কাজের কথা বললেন। সেই কাজে তাঁকে এক জায়গায় পাঠালেন। কাজটি শেষ করতে তাঁর বেশ দেরী হয়ে গেলা। ঘরে গিয়ে পৌঁছতেই মা জিজ্ঞেস করলেন, "আনাস! আজ এতো দেরী কেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

প্রিয় নবী (স) তাঁর একটি কাজে আমাকে পাঠিয়েছিলেন।" আনাস (রা) মাকে জবাব দিলেন।

"কি কাজ?" মা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"সেটা একটা গোপন বিষয়," আনাস (রা) বললেন।

মা বললেনঃ "প্রিয় পুত্র! প্রিয় নবীর (স) গোপন কথা কাউকে বলোনা।"

আনাস (রা) মায়ের এ কথাটি মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছিলেন। প্রিয় নবীর (স) গোপন কথাটি তিনি জীবনে কাউকে বলেন নি।

হযরত সাবেত (রা) ছিলেন তাঁর সবচেয়ে অন্তরংগ বন্ধু। একদিন তিনি ঘটনাটি তার কাছে বর্ণনা করে বললেনঃ

"প্রিয় বন্ধু। সেই গোপন কথাটি যদি আমি কাউকে বলতাম তাহলে সর্বপ্রথম তোমাকে বলতাম।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. হযরত আনাসের (রা) ছেলেবেলা কিভাবে কাটে?

২. প্রিয় নবী (স) হযরত আনাসকে (রা) কোথায় পাঠান?

৩. হযরত আনাস (রা) কখন বাড়ি ফেরেন?

৪. হযরত আনাসের (রা) কথার জবাবে তাঁর মা তাঁকে কি বলেন?

৫. তিনি হযরত সাবেতকে (রা) কি বলেন?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. প্রিয় নবী (স) হযরত আনাসকে (রা) কি দায়িত্ব দিয়েছিলেন?

২. হযরত আনাসের (রা) মতো একজন কিশোর কিভাবে প্রিয় নবীর (স) গোপনীয়তা রক্ষা করেন।

৩. গোপনীয়তা রক্ষা করার অর্থ কি?

মেহনতের মজুরী

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহর প্রত্যেক নবীই দৈহিক পরিশ্রম করে নিজের জীবিকা উপার্জন করতেন। তিনি সব সময় সাহাবাগণকে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করার জন্য পরিশ্রম করার উপদেশ দিতেন। নিতান্ত অক্ষম অবস্থা ছাড়া কারোর সামনে হাত পাততে নিষেধ করতেন।

একবার তিনি সাহাবীদের মজলিসে বসেছিলেন। এমন সময় একজন গরীব আনসার সাহাবী সেখানে হাজির হলেন, আনসারী তাঁর কাছে কিছু ভিক্ষা চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার ঘরে কি কিছুই নেই?"

আনসারী বললেন: "আছে, মাত্র কম দামের একটা কম্বল। আর একটা কাঠের পেয়ালা। কম্বলের এক দিক আমরা বিছাই এবং একদিক গায়ে জড়াই। আর কাঠের পেয়ালাটা পানি পান করার কাজে ব্যবহার করি।"

"যাও, সেদুটি আমার কাছে আনো।" প্রিয় নবী (স) সাহাবীকে হুকুম দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে আনসারী সাহাবী কম্বল ও কাঠের পেয়ালা এনে প্রিয় নবীর সামনে রাখলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দুটি হাতে তুলে নিলেন। তিনি জিনিস দুটি নিলাম করলেন।

"কে কিনবে এই জিনিস দুটি?" তিনি আওয়াজ দিলেন।

"আমি, হে আল্লাহর রসূল! আমি এ দুটি জিনিস এক দিরহামে কিনে নিতে চাই।" বললেন একজন সাহাবী।

"কে এক দিরহামের বেশী দাম দিতে পারে।" দুবার, তিনবার প্রিয় নবী (স) আওয়াজ দিতে থাকলেন।

"আমি দুই দিরহামে নিতে পারি।" আর একজন সাহাবী বলে উঠলেন।

তিনি দুই দিরহামের বিনিময়ে কম্বল ও পেয়ালাটি বিক্রি করে দিলেন। দিরহাম দুটি আনসারীকে দিয়ে বললেন: যাও, এক দিরহাম দিয়ে খাবার কিনে ঘরে নিয়ে যাও।

আর অন্য দিরহামটি দিয়ে একটি কুঠার কিনে নিয়ে এসো। প্রিয় নবীর কথামতো আনসারী সাহাবী বাজারে গেলেন এক দিরহাম দিয়ে খাবার কিনে ঘরে নিয়ে গেলেন। আর এক দিরহাম দিয়ে একটি লোহার কুঠার কিনে নিয়ে নবীজীর কাছে এলেন। প্রিয় নবী (স) নিজের হাতে কুঠারটিতে কাঠের বাঁট লাগিয়ে দিলেন।

"যাও, বনে যাও, কাঠ কাটতে থাকো এবং বাজারে এনে বিক্রি করতে থাকো।" প্রিয় নবী (স) আনসারীকে হুকুম দিলেন। "তবে হাঁ, মনে রেখো আগামী পনের দিন তোমাকে যেন আর এদিকে না দেখি।"

আনসারী সাহাবী কুঠারটি হাতে নিয়ে বনের পথে চলে গেলেন। এরপর থেকে তাঁকে আর কারোর কাছে হাত পাততে দেখা যায়নি। বন থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করতেন এবং তার বিনিময়ে যা পেতেন তা দিয়ে বেশ ভালোভাবে তাঁর সংসার চলে যেতো। এমনকি সংসারের খরচ চলার পরও প্রতিদিন কিছু পয়সা বাঁচতো। পনের দিন পর যখন তিনি প্রিয় নবীর কাছে এলেন তখন তিনি বাড়তি দশ দিরহামের মালিক।

প্রিয় নবী (স) বলেছেন: "যে হাত নিচে থাকে তার চেয়ে অবশ্য সে হাত উত্তম যে হাত উপরে থাকে।" এর মানে হচ্ছে, দান গ্রহণকারীর চাইতে দাতার মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন: যে ব্যক্তি ভিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সেটি তার চেহারায় একটি দাগের সৃষ্টি করবে। তিনি বলেছেন: 'তিন ব্যক্তি ছাড়া কারোর জন্য ভিক্ষা করা বৈধ নয়: যে ব্যক্তি এমন অভাবে পড়েছে যা তার সর্বনাশ ডেকে আনবে, যে ব্যক্তি এমন দেনার দায়ে আবদ্ধ হয়েছে যা তাকে অপমানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবে এবং যে ব্যক্তিকে এমন রক্তপণ আদায় করতে হবে যা দেয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।' কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে তার শাস্তি স্বরূপ হত্যাকারী বা তার উত্তরাধিকারীকে যে অর্থ দণ্ড দিতে হয় তাকে রক্তপণ বলে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ তার রশি নিয়ে পাহাড়ে চলে যাক, নিজের পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে এনে বাজারে বিক্রি করুক এবং তার চেহারাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করুক। এটা তার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে

ভিক্ষা করে বেড়ানোর চাইতে উত্তম। মানুষ তাকে ভিক্ষা দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

তোমরা জানতে পারলে বড় ধরনের কঠিন সংকটে ও বিপদে না পড়লে ভিক্ষা করা বা কারোর কাছে হাত পাতা উচিত নয়। সব সময় নিজে পরিশ্রম করে নিজের রুজি সংগ্রহ করা উচিত।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. আল্লাহর নবীগণ কিভাবে জীবিকা উপার্জন করতেন?
২. আনসারী সাহাবী ভিক্ষা করতে নেমেছিলেন কেন?
৩. দুই দিরহাম দিয়ে প্রিয় নবী (স) আনসারীকে কি কিনে আনতে বললেন?
৪. কুঠারটি সাহাবীর হাতে তুলে দিয়ে প্রিয় নবী (স) তাকে কি নির্দেশ দিলেন?
৫. পনের দিন পরে সাহাবীটি প্রিয় নবীর (স) কাছে কি অবস্থায় গেলেন?
৬. যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে কিয়ামতের দিন তার কি অবস্থা হবে?
৭. মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ঘুরে বেড়ানোর চাইতে উত্তম কি?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. প্রিয় নবী (স) কিভাবে আনসারী সাহাবীকে অর্থ সংগ্রহ করে দিলেন?
২. 'উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম'- প্রিয় নবীর (স) এ কথার অর্থ কি?
৩. কোন্ তিন ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করা বৈধ?
৪. মুসলমান গরীব হতে পারে কিন্তু ভিক্ষুক হতে পারে কি? তুমি কি মনে করো?

আমানতদারী

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ রহমতুল্লাহি আলাইহি বনু উমাইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তিনি একজন বড় আলেমও ছিলেন। রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতিকে পুরোপুরি অনুসরণ করে চলেন। তিনি নিজেকে বায়তুল মালের আমানতদার মনে করতেন। সেখান থেকে একটি কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। নিজের সামান্য সম্পত্তির আয়ে সংসার চালাতেন। বায়তুল মালের প্রত্যেকটি পয়সা অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে ব্যয় করতেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল মাল ছিল রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডার। রাষ্ট্রের সমস্ত আয় এখানে জমা হতো এবং ব্যয়ও এখান থেকে নির্বাহ হতো। প্রিয় নবীর (স) পর খোলাফায়ে রাশেদীন বায়তুল মালের অর্থের পুরোপুরি হেফাজত করেন। সরকারী অর্থ সরকারী কাজ ছাড়া নিজেদের কাজে তারা ব্যবহার করতেন না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজও তাঁদের অনুসরণ করতেন।

একবার রাত্রিকালে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে কিছু লিখছিলেন। এমন সময় তাঁর এক মেহমান এলো। তিনি মেহমানকে নীরবে নিজের পাশে বসিয়ে রাখলেন। তার সাথে কোনো আলাপ করলেন না। তারপর আবার নিজের কাজে মগ্ন হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রদীপটি নিভিয়ে দিলেন এবং অন্য একটি প্রদীপ জ্বালালেন। এবার তিনি মেহমানের সাথে কথা বললেন।

মেহমান একটু অবাক হলো। জিজ্ঞেস করলো: "এ প্রদীপটি আবার জ্বালালেন কেন? আগের প্রদীপেই তো তেল ছিল। সেটা জ্বালিয়ে রাখলে চলতো।"

হযরত উমর (র) জবাব দিলেন: "সেটা হচ্ছে সরকারী প্রদীপ। বায়তুল মালের টাকায় ওই প্রদীপের তেল কেনা হয়েছে। আর এটা আমার নিজের প্রদীপ। আমার

নিজের টাকায় এর তেল কিনেছি। সরকারী প্রদীপের তেল না পুড়িয়ে তোমার সাথে আলাপ করার জন্য আমার নিজের প্রদীপ জ্বালালাম। আমার নিজের কাজে বায়তুল মালের জিনিস খরচ করতে পারিনা।

মেহমান হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের (র) আমানতদারী দেখে মুগ্ধ হলো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'যে আমানতদার নয় তার ঈমানও নেই।' আর আমানতদারী হচ্ছে কারোর কাছে কোন জিনিস গচ্ছিত রাখলে সে সেটার যথাযথ হেফাজত করে। সেটাকে যেভাবে খরচ করতে বলা হয় সেভাবে খরচ করে। নিজের ইচ্ছামতো খরচ বা ব্যবহার করেনা, ঈমানদার ব্যক্তি আমানতদার হয়। দেশের যিনি শাসক তার কাছে দেশের সমস্ত সম্পদ আমানত রাখা আছে। তাকে এই সম্পদের হেফাজত করতে হবে। জনগণের এই সম্পদ তিনি নিজের জন্য ব্যয় করতে পারেন না।

তোমাদের প্রত্যেকের এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। বড় হলে তোমাদের ওপর অনেক ধরনের দায়িত্ব আসবে সেসব দায়িত্ব পালনে তোমাদের অবশ্যই আমানতদার হতে হবে। দেশের, সমাজের, ব্যক্তির যত বড় বা যত ছোট দায়িত্বই আসুক না কেন সব ব্যাপারেই ঈমানদারীর পরিচয় দিতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন নীতি অবলম্বন করেন?
২. তিনি কিভাবে নিজের সংসার চালাতেন?
৩. সর্ব প্রথম বায়তুল মাল কে প্রতিষ্ঠা করেন?
৪. হযরত উমর (র) তাঁর মেহমানের সাথে কথা না বলে তাঁকে নীরবে বসিয়ে রাখেন কেন?
৫. তিনি মেহমানের সাথে কথা বলার জন্য অন্য প্রদীপ জ্বালালেন কেন?
৬. আমানতদারী কাকে বলে?
৭. দায়িত্ব পালনে আমানতদার হতে হবে এর অর্থ কি?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) কে ছিলেন?

২. বায়তুল মাল কাকে বলে? কিভাবে এটা পরিচালনা করা হয়?

৩. হযরত উমর (র) মেহমানের সাথে কথা বলার ব্যাপারে কোন্ ধরনের আমানতদারীর পরিচয় দিলেন?

৪. ঈমানদার ব্যক্তি আমানতদার হয়- একথার অর্থ কি?

৫. দেশের ও জাতির দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমানতদারীর গুরুত্ব কি? বুঝিয়ে বলো।

মেহমানদারী

একবার একজন সাহাবী ক্ষুধায় কাতর হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আহার করাতে চাইলেন। মেহমানের জন্য বাড়ির মধ্যে খাবার চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু ভেতর থেকে খবর এলো, সেখানে পানি ছাড়া খাবার জন্য আর কিছুই নেই। প্রিয় নবীর (স) গৃহে এ ধরনের ব্যাপার এই প্রথম নয়। প্রায়ই তাঁর গৃহে চুলা জ্বলতোনা। গৃহের সবাইকে অনেক সময় অনাহারে থাকতে হতো। এখন কি করা যায়। তিনি সাহাবাদের দিকে তাকালেন। তখন তাঁর সম্মুখে কয়েকজন সাহাবী বসেছিলেন। তাদেরকে বললেন: "আজ রাতের জন্য মেহমানকে কে গ্রহণ করতে পারে?"

হযরত আবু তালহা (রা) বললেন: "হে আল্লাহর রসূল! আমি আজ রাতের জন্য মেহমানকে নিয়ে যেতে পারি?"

তিনি মেহমানকে নিজের গৃহে আনলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করে স্ত্রীকে বললেন: আমার সাথে প্রিয় নবীর (স) মেহমান আছে, তাকে আহার করাতে হবে।"

স্ত্রী বললেন: "মেহমানকে খাওয়াবো কি, আমাদের নিজেদেরই খাবার নেই। কেবল ছেলেদের খাবার মতো সামান্য খাদ্য আছে।"

হযরত আবু তালহা (রা) বললেন: "তুমি ছেলেদের কোনো প্রকারে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। তারপর আমি যখন মেহমানকে গৃহমধ্যে আনবো তখন তার সামনে খাদ্য রেখে প্রদীপটির সলতে ঠিক করার বাহানায় সেটি নিভিয়ে দেবে। আমরাও মেহমানের সাথে খেতে বসে যাবো। অন্ধকারে মেহমান খেতে থাকবেন। আর আমরা খাবার বাহানায় শব্দ করে হাত মুখ নাড়তে থাকবো। মেহমান মনে করবেন আমরাও খাচ্ছি। কাজেই তিনি পেট ভরে খেয়ে নেবেন।

স্ত্রী তাই করলেন। মেহমান এলে তিনি প্রদীপটি নিভিয়ে দিলেন। তারা স্বামী-স্ত্রী ভুখা রইলেন কিন্তু মেহমান পেট ভরে খেলেন। মেহমান জানতেও পারলেন না যে, স্বামী-স্ত্রী সারারাত অনাহারে কাটালেন। মেহমান পেট ভরে খেয়েছেন, এতেই তাঁরা খুশী।

পরদিন সকালে হযরত আবু তালহা (রা) প্রিয় নবীর (স) খেদমতে হাজির হলে তিনি বললেন: "আবু তালহা! মেহমানের সাথে তোমাদের গত রাতের ব্যবহার আল্লাহ অত্যন্ত পছন্দ করেছেন।"

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. প্রিয় নবী (স) মেহমানকে আহার করাতে পারলেন না কেন?
২. ক্ষুধার্ত মেহমানকে কে বাড়িতে নিয়ে গেলেন?
৩. সাহাবীর বাড়িতে কি পরিমাণ খাবার ছিল?
৪. সাহাবীর স্ত্রী প্রদীপটি কিভাবে নিভিয়ে দিলেন?
৫. সাহাবীর বাড়িতে কতজন লোক এবং কত জনের খাবার ছিল?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. প্রিয় নবীর (স) গৃহে প্রায়ই চুলা জ্বলতোনা কেন? কথাটা বিস্তারিত বর্ণনা করো।
২. মেহমানকে পেটভরে আহার করাবার জন্য সাহাবী কি কৌশল অবলম্বন করলেন?
৩. এ ঘটনাটি থেকে ইসলামে মেহমানদারীর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলো।

দানশীলতা

দান করলে সম্পদ কমেনা। যাকে দান করা হয় সে উপকৃত হয়। তার প্রয়োজন পূর্ণ হয়। আর যে দান করে সে সওয়াবের অধিকারী হয়। আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান খরচ করো, তোমার জন্য খরচ করা হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে প্রয়োজন পূরণের পর যা অতিরিক্ত থাকে তা দান করো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করো তাহলে তোমার জন্য এটা কল্যাণকর। আর যদি তা আটকে রাখো তাহলে তোমার জন্য ক্ষতিকর। তোমার যে পরিমাণ দরকার তা ধরে রাখলে তোমাকে তিরস্কার করা হবে না। আর দান-খয়রাত শুরু করবে নিকট আত্মীয়দের থেকে। দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চাইতে উত্তম। প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! তোমার পথে যে খরচ করে তাকে প্রতিদান দাও। অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ক্ষতিগ্রস্ত করো।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো জিনিস চাওয়া হলে জবাবে তিনি কখনো 'না' বলেননি। একবার এক বেদুইন তাঁর কাছে কিছু চাইলো। তিনি দুই পাহাড়ের মাঝখানে যে বিরাট ছাগলের পাল চরে বেড়াচ্ছিল সব তাকে দিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, তোমরা এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, যে কৃপণতা করলো সে মনে করলো তার অর্থ সম্পদ তাকে বড় করে দিয়েছে, সে আর কারোর মুখাপেক্ষী নয়। সে ভালো জিনিস গ্রহণ করলোনা। কষ্টদায়ক জিনিস তার জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে। তার ধন সম্পদ তার কোনো উপকারে আসবেনা যখন সে ধ্বংস হবে। প্রিয় নবী (স) বলেছেন, কৃপণতা ও সংকীর্ণতা তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছে।

বনি ইসরাইলদের জামানায় একজন লোক একটা উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সেখানে চারদিকে কোথাও কোন পানি ছিলনা।

একখণ্ড মেঘ উড়ে এলো তার মাথার ওপর। মেঘের মধ্যে সে শুনতে পেলো একটা ডাক।

'ওমুকের বাগানে পানি দাও।'

মেঘখন্ডটিকে একদিকে উড়ে যেতে দেখলো সে। দেখলো একটি প্রস্তরময় ভূখণ্ডে বৃষ্টি বর্ষিত হলো।

এই বৃষ্টির পানি ছোট ছোট নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে একটি বড় নালায় গিয়ে পড়লো। এই বড় নালাটি পুরো বাগানটিকে বেষ্টন করে নিয়েছিল।

লোকটি মেঘখন্ডের পেছনে পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে বাগানের কাছে পৌঁছে গেলো।

দেখলো বাগানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতের বেলচা দিয়ে এদিক ওদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করলো,

হে আল্লাহর বান্দা! আপনার নাম কি?

লোকটি তার নাম বললো। অর্থাৎ মেঘখন্ডের মধ্যে যে নাম উচ্চারিত হয়েছিল সে নাম।

বাগানের মালিক বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করছো কেন?

জবাবে লোকটি বলল, যে মেঘখন্ড থেকে এ পানি বর্ষিত হলো তার মধ্যে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। তাতে আপনার নাম উচ্চারণ করে আপনার ক্ষেতে পানি বর্ষণ করতে বলা হয়েছিল। আমার জানার আগ্রহ হচ্ছে, এ বাগানে আপনি এমন কি করেন যার ফলে এখানে পানি বর্ষণ করতে বলা হলো?

বাগান মালিক বললো, আপনি যখন আমার কাছে জানতে চাইলেন তখন বলতেই হয়। এ বাগানে যা কিছু উৎপন্ন হয় আমি তার সবকিছু দেখাশুনা ও নিয়ন্ত্রণ করি। উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের একভাগ অভাবীদেরকে দান করি? তিনভাগের একভাগ আমার পরিবার পরিজনদের জীবিকার জন্য ব্যয় করি। আর বাকি তিনভাগের একভাগ বীজ হিসেবে রাখি এবং পুনরায় এই ক্ষেতে লাগিয়ে দেই।

এই লোকটি কৃপণতা করেনি। সে তার সম্পদ থেকে অভাবী ও গরীবদের হক আদায় করেছে। ফলে আল্লাহ তার সম্পদে বরকত দান করেছেন। তার প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন।

দান কেবল এক ব্যক্তির দান নয়। বরং যাকে দান করা হয় তার হক এবং ন্যায্য পাওনা। তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, ধনীদের ধন সম্পদে গরীব, মিসকিন, অভাবী, যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।

কাজেই দান করা এবং দানশীলতা কেবল একটি মহৎ গুণ নয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক অধিকারও। অভাবী ও মিসকিনদের দান করার ব্যাপারে আমাদের সবার যত্নশীল হতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. কি দান করতে হবে?

২. কি পরিমাণ সম্পদ মানুষ রাখতে পারে?

৩. প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে এসে কি বলেন?

৪. প্রিয় নবীর (স) কাছে কোনো প্রার্থী কিছু চাইলে তিনি কি করতেন?

৫. কৃপণতা কাকে বলে?

৬. লোকটি মেঘখন্ডের মধ্যে কি শুনেছিল?

৭. ধনীদের সম্পদে কাদের অধিকার রয়েছে?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চাইতে উত্তম- একথার অর্থ কি?

২. এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাও- কথাটি কে বলেছেন? কেন বলেছেন?

৩. কৃপণতা কৃপণকে কিভাবে ধ্বংস করবে? বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলো।

৪. বনি ইসরাইলের বাগান মালিক তার উৎপাদিত শস্য কিভাবে ব্যয় করতো?

৫. দান একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক অধিকার- কথাটি ঠিকমত বুঝিয়ে বলো।

ক্ষমা মহৎ গুণ

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। ক্ষমা মানুষকে সুন্দর ও মহান করে। ক্ষমা করার জন্য অনেক বড় হৃদয়ের এবং অনেক মানসিক শক্তির প্রয়োজন। যার মনের জোর নেই সে সহজে কাউকে ক্ষমা করতে পারে না। কাউকে ক্ষমা করতে হলে তার দোষ ক্রটিগুলোকে বড় করে দেখা যাবে না। কুরআন মজিদে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তারা যেন ওদের ক্ষমা করে দেয় এবং ওদের দোষ ক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল দয়ালু'।

ক্ষমা মানে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। আমার ওপর যে জুলুম অত্যাচার হয়েছে আমি তার প্রতিশোধ নিতে পারি, এ ক্ষমতা আমার আছে এবং এরপরও আমি প্রতিশোধ নিতে চাই না। আমি বিরোধী পক্ষকে ক্ষমা করে দিতে চাই। এটিই সর্বোত্তম ক্ষমা।

নবুওয়াতের দশম বছরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার লোকদের ব্যাপারে একেবারে হতাশ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে নিশ্চিত ধারণা জন্মালো এরা সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করবে না। মক্কার ব্যাপারে হতাশ হয়ে তিনি এগিয়ে চললেন পার্শ্ববর্তী তায়েফ শহরের দিকে। তায়েফ ফলে-ফসলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ শহর।

কিন্তু তায়েফবাসীরাও তাঁর সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। তারা তাঁকে চরমভাবে অপমানিত ও নির্যাতিত করে শহর থেকে বের করে দিল। তায়েফের সরদাররা তাঁকে পাগল আখ্যায়িত করে বাজারের দুষ্ট লোকদের ও ছোট ছেলেদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে পাথর মারতে মারতে পেছন দিয়ে তাড়া করলো। পাথরের আঘাতে তাঁর দুই পা রক্তাক্ত হয়ে গেলো। তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। বসে পড়ছিলেন। দুষ্টের দল তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল। তিনি চলতে থাকলে আবার পায়ে পাথর মারছিল। সাথে সাথে গালিও দিচ্ছিল এবং হাততালি দিয়ে চলছিল।

অবশেষে তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জনবসতির এক প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। সেখানে একটি বড় ফলের বাগান ছিল। থোকায় থোকায় টসটসে আঙ্গুর ফল ঝুলছিল। তার মধ্যে ঢুকে পড়ে তিনি নিজেকে আড়াল করলেন। আল্লাহর কাছে নিজের অসহায়তা ও যন্ত্রনার কথা তুলে ধরলেন।

কিন্তু মুশরিকদের আচরণের জন্য আল্লাহর কাছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলেন না। তাদের অশেষ অজ্ঞতার জন্য তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তিনি বলেন, উহুদের দিনের চাইতেও বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি আকাবার দিন। সেদিন তাঁর কওম তাঁর তওহীদের দাওয়াত সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল। চিন্তিত মনে হাঁটতে হাঁটতে তিনি কারনুস সাআলিব নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর প্রায় হুঁশই ছিলনা।

সেখানে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করার জন্য উপরের দিকে মাথা তুলতেই দেখলেন এক খণ্ড মেঘ তাঁর মাথার ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন জিব্রীল আলাইহিস সালামকে।

জিব্রীল তাঁকে বললেন, মহান আল্লাহ আপনার কওমের কথা এবং আপনাকে তারা যে জবাব দিয়েছে তা শুনেছেন। আল্লাহ আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। তাকে আপনি নিজের ইচ্ছামতো ওদের বিরুদ্ধে হুকুম দিতে পারবেন।

পাহাড়ের ফেরেশতা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিয়ে বললেন,

হে মুহাম্মদ! আল্লাহ আপনার সাথে আপনার কওমের কথাবার্তা শুনেছেন। আমি হচ্ছি পাহাড়ের ফেরেশতা। আমাকে আমার রব আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি নিজের ইচ্ছামতো আমাকে যে কোনো কাজের হুকুম করতে পারেন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি মক্কার দুই দিক বেষ্টনকারী আল আখশাবাইন পাহাড় শ্রেণীকে মক্কাবাসীদেরসহ দুই দিক থেকে মিলিয়ে দেই। প্রিয় নবী (স) বললেন, (আমি তাদের ধ্বংস কামনা করিনা) আমি বরং আশা পোষণ করি, আল্লাহ এদের ঔরসে

এমন সব লোক পয়দা করবেন যারা এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল করে নেবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবেনা।

এ ছিল প্রিয় নবীর (স) ক্ষমার আদর্শ এবং মানবতার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি। তিনি মানবতার কল্যাণ চান, ধ্বংস চাননা।

তাই মুশরিকদের চরম শক্রতার কারণে যে জন্মভূমি মক্কা থেকে রাতের আঁধারে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যখন সেই মক্কা জয় করলেন, কাফের মুশরিক ও ইহুদীদের সকল অহংকার ধূলায় মিশে গেলো। তখনও তিনি শক্রদের ওপর প্রতিশোধ নিলেননা। উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কেনো অভিযোগ এবং কোনো গ্রেফতারী পরোয়ানা নেই। যাও তোমরা সবাই মুক্ত।

এ ছিল দুনিয়ার বুকে ক্ষমার শ্রেষ্ঠ নজির।

প্রিয় নবীর (স) পর মুসলমানরা এ ধরনের ক্ষমার চর্চা করেছেন। ইতিহাসের পাতায় এর অজস্র স্বাক্ষর রয়েছে।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. ক্ষমা অর্থ কি?

২. সর্বোত্তম ক্ষমা কাকে বলে?

৩. প্রিয় নবী (স) তায়েফে দাওয়াত দিতে গেলেন কেন?

৪. তিনি তায়েফবাসীদের আচরণের কি জবাব দিলেন?

৫. উহুদের দিনের চাইতেও বেশি কষ্ট তিনি কখন পেয়েছিলেন?

৬. কোথায় তিনি মাথার ওপর এক খন্ড মেঘ দেখলেন?

৭. জিব্রীল আলাইহিস সালামের সংগে আর কে ছিলেন?

৮. মক্কার দুইদিক বেষ্টনকারী পাহাড়ের নাম কি?

৯. মক্কা বিজয়ের পর প্রিয় নবী (স) তাঁর চরম শক্রদের কি বললেন?

বিস্তারিত জবাব দাও ঃ

১. ক্ষমা একটি মহৎ গুণ কেমন করে?

২. তায়েফবাসীরা প্রিয় নবীর (স) তওহীদের দাওয়াতের জবাব কিভাবে দিল?

৩. কারনুস সাআলিবে হযরত জিব্রীল ও পাহাড়ের ফেরেশতা তাঁকে কি বলেন?

৪. পাহাড়ের ফেরেশতার প্রস্তাবের জবাব তিনি কিভাবে দেন?

৫. মুসলমানদের কোনো ঐতিহাসিক ক্ষমার দৃষ্টান্ত তোমার জানা থাকলে নিজের ভাষায় লেখ।